খেয়া
সম্পাদকঃ শান্তনু চ্যাটার্জি
আহ্বায়কঃ দেবদীপ দে

অ্যাসোসিয়েশন
সভাপতিঃ সুকমল ঘোষ
সম্পাদকঃ সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন
২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০০১৯

Issue: 2025Q204 | Date: 22-Jun-2025

email: jbi.alumni.1914@gmail.com
Website: www.jagadbandhualumni.com/KheyaLive
রেজি নং S/7337 under WB Act XXVI of 1961

বিষয় ভাবনা – আমার শহর কলকাতা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

নিবন্ধ

রামমোহন ও সেকালের কলকাতা - প্রসূন গঙ্গোপাধ্যায় ৫

উনিশ শতকের কলকাতার অপেশাদার নাট্যচর্চা - অলোক সরকার ৯

শহর কলকাতার কিডনি - সন্দীপ চক্রবর্তী ১৪

কলকাতা বন্দরের একাল সেকাল - অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭

কোন্ বাংলায় লিখব? - সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় ২০

কয়েক টুকরো কলকাতা - একটি কোলাজ - শান্তনু চ্যাটার্জি ২৪

কলকাতার ফুটবল মাঠের মেঠো কথা - সঞ্জয় মুখার্জি ২৮

সেই সব ছবিগুলো - ভাস্কর গুপ্ত ৩০

কবিতা

রূপান্তর - আশিস কুমার সেন ৩২

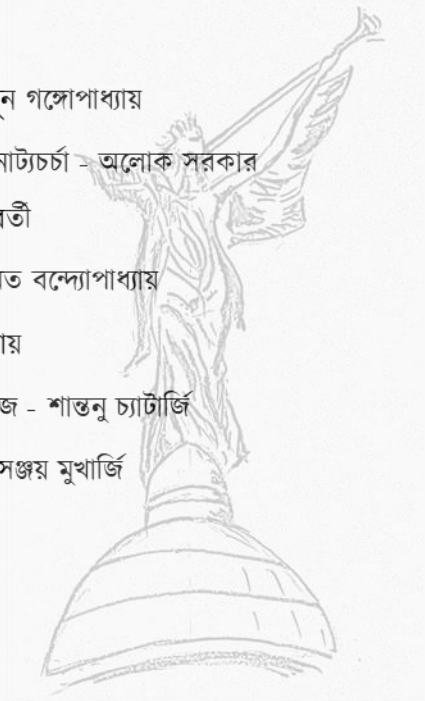

পরের খেয়া : প্রকাশকাল অক্টোবর ২০২৫

সম্পাদকীয়

এবারের খেয়ার বিষয়, আমাদের প্রিয় কলকাতা। ইংরেজিতে যাকে বলে "লার্জার দ্যান লাইফ" সে রকম "গ্রেটার দ্যান ইটস জিয়োগ্রাফি" বলে যদি কিছু ভাবা যায়, কলকাতা হল তাই। বাংলা ব্যাঞ্জনবর্ণের প্রথম বর্ণ - 'ক'। কলকাতারও প্রথম বর্ণ 'ক'। এই ক-য়ে কালীঘাট থেকে শুরু করে কমবেশি ৭০০ বর্গ মাইল ঘুরে আবার ক-য়ে ক্যাওড়াতলা শ্মশানে শেষ; এ ভাবেও কি বর্ণনা করা যায় কলকাতাকে। তাহলে কি এর মধ্যে ধরা পড়ে ভোরের গঙ্গাস্নান আর গঙ্গাপাড়ের দলাইমলাই, মল্লিকঘাটের ফুলের বাজার, বেলার বাসে অফিসযাত্রীর ভিড়, দুপুরের অফিসপাড়ার অস্থায়ী ভোজনালয়ে বিশ্বখাদ্য সম্ভার, বিকেলে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকের দিকে কলেজফরতা যুবতীর আড়চাহনি অথবা লেকের মাঠে ফুটবল, শেষ বিকেলের ফুচকায় ঝালের তারতম্য, গাঢ় সন্ধ্যায় ফারপো (অধুনা বিলুপ্ত), গ্রেট ইস্টার্ন, পার্ক স্ট্রিটের যৌবন জৌলুস, পাড়ায় পাড়ায় কুলফি বেলফুল, এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে হারমোনিয়ামে গলা সাধার আওয়াজ? কোন বর্ণনায় বোঝানো যায় রাস্তার জ্যামজট, বেলাগাম অটোর দৌরাত্ম্য, শনি পুজো বা যে কোনও অজুহাতে মাইকের তারস্বরে আর্তনাদ, বহুতল ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে রাস্তায় আবর্জনার প্যাকেট ছুঁড়ে ফেলা, পকেটমারের নিপুণ হাতের কারসাজি, পথপুলিশের প্রকাশ্যে ঘুষ নেওয়া, হকারের ফুটপাথ আগ্রাসন কিংবা হাওড়া শেয়ালদা দমদমে ট্যাক্সিওলাদের দাদাগিরি! এই ভালো মন্দ মাঝারি সবকিছুই কলকাতার নিজস্ব। আর কোনও শহরের সঙ্গে এর তুলনা চলে না। কিছু কিছু মিল অবশ্যই পাওয়া যায় যেমন যোধপুর পার্ক বা নিউ আলিপুরের রাস্তার সঙ্গে বেঙ্গালুরুর ছায়াঘেরা নিরিবিলি পথ, মন্দিরবহুল জম্মুর সঙ্গে উত্তর কলকাতার অলিগলির ছোট কিন্তু জাগ্রত অসংখ্য প্রাচীন শিবমন্দির বা কালীমন্দির, নতুন বাজার থেকে শোভাবাজার চিৎপুর রোড সংলগ্ন অঞ্চলের সঙ্গে পুরোনো দিল্লি বা এ রকম আরও অনেক। চায়ের দোকানে মস্কো নিয়ে মস্করা, কফি হাউসে কাফকা চর্চা, রবীন্দ্র সরোবরের মাঠে বা বিবেকানন্দ পার্কে অথবা ময়দানে খোলা চত্বরে এমনকী ভারতের জাতীয় দলেও চান্স পাওয়া প্রাক্তন খেলোয়াড়দের নিয়মিত কোচিং, খ্যাতির মধ্যগগনে অবস্থিত বিতর্কিত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর বুলেট মোটরবাইক নিয়ে নির্দিষ্ট পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পান কিনে জীবনবীমা অফিসে ঢুকে যাওয়া এ রকম বিবিধ খাতে অহরহ বয়ে যাওয়া আবেগের স্রোত যে মোহনায় এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তার নাম কলকাতা। এই সব আবেগ, সমস্ত অনুপুঙ্খ নিয়ে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে তিলোত্তমা কলকাতা।

রবি ঠাকুরের বিখ্যাত কবিতার লাইন একটু এদিকওদিক করে বলা যায়, কলকাতা চলিয়াছে বাড়িতে বাড়িতে। উপরে মাথার দিকে বাড়তে বাড়তে বারাসত ব্যারাকপুর, দক্ষিণে বারুইপুর ও বজবজ ছুঁইছুঁই। পশ্চিমে হুগলি নদী, ওপারে হাওড়া; তাই এদিকে বিস্তারের কোনও সুযোগ নেই। পূর্ব দিকে উপনগরী সল্টলেক, নিউটাউন ও রাজারহাট। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ ও নিউটাউন দেশের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির অন্যতম পীঠস্থান।

কলকাতা তিলোত্তমা, কলকাতা আনন্দনগরী, কলকাতা উৎসবনগরী। বর্তমান কলকাতার প্রধান উৎসব হল দুর্গোৎসব। বিশেষত বারোয়ারি দুর্গোৎসব। বর্ষা ফুরোলেই খুঁটিপুজোর মাধ্যমে শুরু হয়ে যায় সাজো সাজো রব। পাড়ার ক্লাবে ঘন ঘন মিটিং, বাজেট তৈরি করা, বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ, চাঁদা তোলা ইত্যাদি হাজারো কাজ। মহালয়ার ভোরে বীরেন ভদ্র মহাশয়ের সংস্কৃত ঘুম ভাঙানিয়া কলকাতাকে দৈনন্দিনতার সমস্ত অবসাদ থেকে জাগিয়ে তুলে নিয়ে যায় এক অন্য লোকে। যেখানে আকাশের রং বদলে যায়, অন্য রকম হাওয়া বয়, চারিদিকে এক অন্যরকম গন্ধ।

এই বিশাল বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, পরিবর্তনশীল শহর কলকাতার বিভিন্ন রূপ ও আঙ্গিককে ধরার এবং ভাষায় প্রকাশ করার এক দুরূহ প্রয়াস এবারের খেয়া।

আমার শহর

দেবদীপ দে

রামমোহন ও সেকালের কলকাতা

প্রসূন গঙ্গোপাধ্যায়

আজ থেকে প্রায় ২৫৩ বছর আগের কথা, আমাদের দেশে তখন বিরাজ করছে চরম বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। মোঘল সাম্রাজ্য অস্তাচলে, ইংরেজ শাসনের সূচনা, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি কোনও ক্ষেত্রেই আশার আলো নেই। এক নিদারুণ নৈরাশ্য মানুষের মনকে গ্রাস করেছে। এই সন্ধিক্ষণে, ২২শে মে, ১৭৭২ সাল, পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এখনকার কলকাতা থেকে প্রায় ৮০ কি.মি. দূরে হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার এক প্রত্যন্ত গ্রামে খানাকুল-কৃষ্ণনগর মধ্যবর্তী রাধানগরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রামকান্ত রায়ের দ্বিতীয় পুত্র রামমোহন রায় নামে এক আশ্চর্য পুরুষ। এঁদের পদবী ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল যিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন ত্যাগ করে নবাব সরকারের কর্ম গ্রহণ করবেন তিনি 'রায়' উপাধিপ্রাপ্ত হবেন।

রামমোহনের প্রাথমিক শিক্ষা হয় গ্রামের পাঠশালাতে, ফার্সি ছিল তখনকার দিনে রাজভাষা। আরবি ও ফার্সি ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি ৯ বছর বয়সে পাটনা যান। এরপর কাশীধামও গিয়েছিলেন উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য। পরবর্তীকালে তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ডের কথা আমরা সকলেই জানি। বিশদভাবে সেগুলি আর এখানে উল্লেখ করছি না।

এই প্রবন্ধ যেহেতু রামমোহন এবং তাঁর সময়কার কলকাতাকে নিয়ে সেই হেতু কলকাতার প্রতিষ্ঠা এবং তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে জানার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয় আছে। আমি সংক্ষিপ্তভাবে বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলির উল্লেখ করার চেষ্টা করব। ইংরেজরা আমাদের দেশে উৎপন্ন কিছু জিনিস যেমন মশলা, মসলিন, সোরা, আফিম ইত্যাদির লোভে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এ দেশে এসে হাজির হয়েছিল ব্যবসার জন্য। মশলা ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু।

নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথকে ১৯১৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রথম সংবর্ধনা দেওয়া হয় এই রামমোহন লাইব্রেরির প্রেক্ষাগৃহে।

এ রকম একটি সুযোগের অপেক্ষায় তারা ছিল। ১৫৯৯ সালে ২২শে ডিসেম্বর জন ওয়াটস, উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিস, জর্জ ক্লিফোর্ড, জন স্পেন্সার, স্যার জন মেডেন এবং ইংল্যান্ডের আরো কিছু ব্যবসায়ীকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি বাণিজ্য সংস্থা, তার নাম দেওয়া হল 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'। তখন ইংল্যান্ডের সিংহাসনে ছিলেন রানি এলিজাবেথ (১ম)। রানির আদেশ পেয়ে কয়েকটি জাহাজ নিয়ে মেডেন ভারতের অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেই সময় ভারতের সম্রাট ছিলেন আকবর। নানারকম ভাবে আকবরকে খুশি করার চেষ্টা করলেন তারা, ইতিমধ্যে আকবরের আমল ফুরিয়ে গিয়ে দিল্লির দরবারে বসেছেন সম্রাট জাহাঙ্গির। সেই সময়

পর্তুগিজরা আমাদের দেশে বেশ জাঁকিয়ে বসে ব্যবসা করছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্যাপ্টেন বেস্টকে আধুনিক রণসজ্জায় তৈরি সৈন্য দিয়ে পাঠালেন। তাদের গোলাবারুদের কাছে না পেরে পর্তুগিজরা হটে গেল। সম্রাট জাহাঙ্গির এই খবরে খুশি হয়ে ভারতের মাটিতে ইংরেজদের ব্যবসা করার অনুমতি দিলেন। এরপর আর ইংরেজদের ফিরে তাকাতে হয়নি। ঔরঙ্গজেবের হুকুমে তখন বাংলার নতুন নবাব হয়ে এলেন ইব্রাহিম খাঁ। সেই সময় ইংরেজদের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন 'জব চার্নক'। তিনি ১৬৯০ সালের ২৪শে অগাস্ট রবিবার গঙ্গার উপকণ্ঠে সুতানুটি গ্রামে এসে ঘাঁটি গড়লেন। ঐতিহাসিকদের মতে এই দিনটিকে কলকাতার প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে ধরা হয়। কলকাতা গড়ে উঠেছিল সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম নিয়ে।

পরবর্তী ইতিহাস আমাদের সকলের জানা, ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন, বৃহস্পতিবার পলাশির একটি মাঠে মাত্র ৯ ঘন্টার যুদ্ধে তখনকার বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা ইংরেজদের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। ইংরেজরা এই যুদ্ধের নাম দিয়েছিলেন "দি ব্যাটল অব প্লাসি"। এই যুদ্ধে ইংরেজদের দুজন সেনাপতি ছিলেন—একজন ওয়াটসন আর অন্যজন রবার্ট ক্লাইভ। এরপর থেকেই কলকাতার উন্নতির কাজ শুরু হয়। রবার্ট ক্লাইভ হয়ে উঠলেন সর্বেসর্বা। প্রথমেই তিনি একটি কেল্লা তৈরি করলেন। তার নাম দেওয়া হল 'ফোর্ট উইলিয়াম'। ১৭৬৭ সালে ক্লাইভের কার্যকাল শেষ হওয়ার পর এ দেশের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন ওয়ারেন হেস্টিংস। কলকাতার বেশিরভাগ উন্নতির কাজ তাঁর আমলে হয়। তিনি কলকাতাকে করেছিলেন বাংলার রাজধানী। ডাকব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক, ছাপাখানা স্থাপন, পরিবহণ ব্যবস্থা, সংবাদপত্র, হাসপাতাল তাঁর আমলে হয়েছিল। কলকাতায় প্রথম ঘোড়দৌড় হয় ১৭৯৩ সালে, প্রথম ক্রিকেট খেলা হয় ১৮০৪ সালে। এই সময়টা ছিল রামমোহনের কৈশোর ও যৌবনকাল।

পুরনো হাওড়া ব্রিজ

পুরনো ধর্মতলা

রামমোহন ১৮১৫ সালে পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় বসবাস করতে আরম্ভ করেন। উত্তর কলকাতার মানিকতলার কাছে একটি বাড়ি কেনেন এবং এখানে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত বসবাস করেছেন, মানে বিলেত যাওয়ার আগে পর্যন্ত। এই বাড়িটি এখন উত্তর কলকাতার পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের অফিস। রামমোহনের বিশাল কর্মকাণ্ডের এবং কলকাতার সব ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়, কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি —

১৮১৫ – 'আত্মীয় সভা' স্থাপন

১৮২৩ – সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

১৮২৪-২৫ – সমাজসংস্কার মূলক বিবিধ পুস্তক প্রকাশ

১৮২৮ – ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা

১৮২৯ – সতীদাহ নিবারণ সম্পর্কে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সঙ্গে আলোচনা

১৮৩০ – ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব গৃহের দ্বরোদ্ঘাটন, ডাফ সাহেবকে স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য

১৮৩৩ – ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে রাজা রামমোহন রায়ের মহাপ্রয়াণ।

কলকাতার প্রতিষ্ঠার পর থেকে রামমোহনের মৃত্যু পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু কিছু ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা হল। সেই সময় কিন্তু কলকাতায় সর্বক্ষেত্রে সাহেবিয়ানা বজায় ছিল।

এবারে আমরা রামমোহনের মৃত্যুর পর থেকে স্বাধীনতার ৫০ বছর পর অবধি কলকাতার পারিপার্শ্বিক অবস্থা কেমন ছিল তার পর্যালোচনা করব সংক্ষিপ্ত ভাবে।

১৮৩৫ – মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন

১৮৪৩ – ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠন করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৫৪ – কলকাতায় প্রথম রেলগাড়ি চালু হয়

১৮৬৮ – প্রথম বড় ডাকঘর তৈরি হয় কলকাতায়

১৮৭০ – কলকাতা বন্দরের পত্তন হয়

১৮৭২ – প্রথম বড় আদালত তৈরি হয় কলকাতায়

১৮৭৫ – কলকাতায় যাদুঘর নির্মিত হয়

১৮৭৮ – কলকাতা কর্পোরেশন গঠিত হয়

১৮৮০ – প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হয়

১৮৮৯ – প্রথম বাইসাইকেল চালু হয়। ‘কুন্তলীন’ তেল খ্যাত হেমেন্দ্রনাথ বোস ছিলেন এর প্রস্তুতকারক

১৮৯৯ – কলকাতায় প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হয়

১৯০৩ – প্রথম মোটরগাড়ি চালু হয়

১৯০৪ – উত্তর কলকাতার অধুনা ২৬৭ নম্বর আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সহযোগিতায় রামমোহনের নামাঙ্কিত একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এর নাম দেওয়া হয় ‘রামমোহন লাইব্রেরি এন্ড ফ্রি রিডিং রুম’। এর প্রথম প্রেসিডেন্ট হন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এই লাইব্রেরির আজীবন সহ সভাপতি ছিলেন। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথকে ১৯১৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রথম সংবর্ধনা দেওয়া হয় এই লাইব্রেরির প্রেক্ষাগৃহে।

১৯০৫ – বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন

১৯২০ – কলকাতার প্রথম টানা রিকশা চালু

১৯২১ – ২৮শে ডিসেম্বর কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দ্বারোদ্ঘাটন

১৯২২ – কলকাতায় প্রথম মোটর-চালিত বাস চালু হয়

১৯২৮ – ওয়াল ফোর্ড কোম্পানি কলকাতায় প্রথম দোতলা বাস চালু করে

১৯৪৭ – ১৫ই অগাস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। কলকাতা সহ সারা ভারতবর্ষ তখন উত্তাল হয়ে ওঠে

১৯৪৮ – কলকাতায় প্রথম স্টেট বাস চালু হয়

১৯৬৮ - কলকাতায় প্রথম বারোয়ারি বা সার্বজনীন দুর্গোৎসব হয় সিমলা ব্যায়াম সমিতির মাঠে

১৯৭২ – কলকাতায় পাতালরেলের ভিত্তি স্থাপন করা হয়

১৯৮৪ – পরীক্ষামূলক ভাবে প্রথম পাতালরেল চালু হয় কলকাতাতে

আরো অনেক কিছু কলকাতাতে হয়েছে কিন্তু সব উল্লেখ করা এখানে সম্ভব হল না। কলকাতার জৌলুস কিন্তু এই সময়েই বিশেষভাবে ছিল।

আমাদের এই প্রিয় কলকাতাকে নিয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখা কবিতার অংশ এখানে উল্লেখ করে আমার এই প্রবন্ধ শেষ করছি —

"কলিকাতা শোনে নাকো চলার খেয়ালে,
নৃত্যের নেশা তার স্তম্ভে দেয়ালে"
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"ধন্য ধন্য কলিকাতা শহর
স্বর্গের শ্রেষ্ঠ সহোদর"
-রূপচাঁদ পক্ষী

"ভুলেই গেছিনু কোথা এই ধরামাঝেতে
আছে সে শহর এক কলকেতা নামেতে"
-সুকুমার রায়

"গ্যাসের আলো নিবে গিয়ে
জ্বললো বিজলী আলো
দিনের শোভা রাতে এলো
ঘুচলো আঁধার কালো"
-শ্যামসুন্দর দে

"চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী
চারদিকে রঙ ছড়িয়ে বেড়ায় রঙ্গিলা কুরঙ্গী
যে সকলের মন মাতালো
কলকাতায় চৌমাথায়"
-কাজী নজরুল ইসলাম

"আজব শহর কলকাতা
মাটির তলায় রেল পাতা
সুড়ং দিয়ে নামছে মানুষ
যাচ্ছে রসাতলে
পাতালযাত্রী দল
মাটির উপর ট্রামবাস
মাটির তলায় রেল
ভানুমতীর খেল"
-অন্নদাশঙ্কর রায়

তথ্যসূত্রঃ

বিশ্বপথক রামমোহন – ড. পরেশ চন্দ্র দাস
কোলকাতা ৩০০ – সত্য চক্রবর্তী

উনিশ শতকের কলকাতার অপেশাদার নাট্যচর্চা

অলোক সরকার

রুশদেশীয় ভাগ্যান্বেষী গেরেসিম লেবেদেফ গবেষকদের চোখে বাংলা ভাষায় নাট্যাভিনয়ের পথিকৃৎ হতে পারেন, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ১৭৯৫ সালে সাবেক কলকাতার বুকে ডোমতলা অঞ্চলে (আজকের এজরা স্ট্রিট) বাংলা নাট্য আয়োজনের যে উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন তা কালের নিরিখে প্রথম হলেও কার্যত ছিল একক ও বিচ্ছিন্ন এক প্রয়াস। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে পরবর্তী এক দীর্ঘ কালপর্ব ছিল নিষ্ফলা, অনুর্বর। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা নাট্যচর্চা সেভাবে সংগঠিত কোনও রূপ পায়নি। বাংলায় নবজাগরণের সাথে সাথে উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এক যুব সম্প্রদায় বিদেশি থিয়েটারের অভিনয়ধারা ও মঞ্চ পরিকল্পনার কাঠামোটিকে অনুসরণ করে দেশীয় ভাষায় নাটক মঞ্চস্থ করতে উঠেপড়ে লাগলেন। তবে এই নাট্যপ্রয়াস ছিল মূলত শখ ও নেশার তাগিদে, বিত্তবাসনাপ্রসূত নয়।

কলকাতার এই শৌখিন থিয়েটারের সময়কাল মোটামুটি ১৮৩১ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত। গবেষক প্রাবন্ধিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭২ সাল পর্যন্ত বাংলায় নাট্যচর্চাকে ‘শখের থিয়েটার’ বলেছেন। বস্তুত ১৮৭৬ সালের নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগের পরবর্তী অধ্যায়ে কলকাতার নাট্যমঞ্চ ধনবান ব্যবসায়ী প্রকাশচাঁদ জহুরী, গুরমুখ রায় প্রমুখের হাতে চলে যায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ পার্কার কোম্পানির চাকরি ছেড়ে এই ধনকুবেরদের অধীনস্থ বেতনভোগী ম্যানেজার হন এবং থিয়েটার পরিচালনা শুরু করেন। এই সময় থেকেই কলকাতার নাট্যচর্চা এক ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে, যাকে তথাকথিত পেশাদার থিয়েটার বলা ধরে নেওয়া হয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ পার্কার কোম্পানির চাকরি ছেড়ে এই ধনকুবেরদের অধীনস্থ বেতনভোগী ম্যানেজার হন এবং থিয়েটার পরিচালনা শুরু করেন। এই সময় থেকেই কলকাতার নাট্যচর্চা এক ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে

টিকিট বিক্রি করে অভিনয়ের আসর বসানো এবং সর্বসাধারণের জন্য রঙ্গালয়ের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়া অবশ্যই এই পেশাদার থিয়েটারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে এই দুটি যে পেশাদার থিয়েটারেরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য তা কিন্তু নয়। উনিশ শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশকে অপেশাদার নাট্যচর্চার যে ধারাটি উত্তর কলকাতার বুকে ধীরে ধীরে অবয়ব পাচ্ছিল, সেখানেও বেশ কয়েক ক্ষেত্রে টিকিট বিক্রি করে নাটক দেখার বন্দোবস্ত রাখা হয়েছিল। ‘শখের থিয়েটার’ কথাটি সাধারণ ব্যবহারে একটু সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করা হলেও ব্রজেন্দ্রনাথ যে অর্থে শখের থিয়েটার শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার পরিসর কার্যত ছিল অনেক বেশি পরিব্যপ্ত। বারোয়ারি তলায়, পূজা পার্বণে, কাপ্তেন বাবুদের ফুর্তির আসরে যে নাটক অভিনীত হত তা ছিল নেহাতই উদ্দেশ্যহীন

আয়োজন, সেখানে সৃজনী শক্তিকে, পরিচালন ক্ষমতাকে কোনও বৃহত্তর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রয়াস ছিল না। এ ধরনের অভিনয় আয়োজনকে শখের থিয়েটার বলে অভিহিত করা প্রত্যাশিত, কিন্তু একই কালপর্বে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের থিয়েটারে (১৮৩১ সাল থেকে), নবীন চন্দ্র বসুর শ্যামবাজারের বাড়িতে (১৮৩৫ সালে শ্যামবাজারের এখানে প্রথম বাংলা নাটক "বিদ্যাসুন্দর" অভিনীত হয়), শোভাবাজারের বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চে (১৮৫৬/৫৭) যে অপেশাদার অভিনয় মঞ্চস্থ হত, তাকে শখের থিয়েটার বলে এক আসনে বসানো সঙ্গত নয়। এই পর্বের কাজের মধ্যেও থিয়েটারকে স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা ছিল। পরবর্তীকালে জাতীয় থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পথটি সুগম করেছিল এই নাট্য উদ্যোগগুলি।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর

১৮৫৭ সাল থেকে পত্রপত্রিকার সমালোচনা প্রবন্ধ ইত্যাদি থেকে বোঝা যায়, এই অপেশাদার নাট্য আয়োজনগুলি একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য মাথায় রেখে সংগঠিত রূপ ধারণ করতে শুরু করেছে। অভিজাত পরিবারগুলির প্রাসাদ-মঞ্চগুলির অভিনয় আসরের বাইরে সাধারণ মানুষের মধ্যে নাটক সম্বন্ধে আগ্রহ এই সময় থেকে ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই যুগের শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। **বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চে** ‘বিক্রমোর্বশী’ নাটকের অভিনয় হয় ১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাসে। সেই নাট্যপ্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু পাশাপাশি পত্রিকায় এ কথাও বলা হয় যে সর্বসাধারণের জন্য নাটকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে।

বাংলা ভাষায় নাট্যাভিনয়ের জন্য সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সে যুগের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আগ্রহটি সহজবোধ্য। বিত্তবানদের প্রাসাদ-মঞ্চে সাধারণ মানুষের প্রবেশ অধিকার ছিল নিয়ন্ত্রিত। তাই সাধারণ রঙ্গালয় সর্বসাধারণের প্রবেশ ও উপভোগের একটি পরিসর গড়ে তুলবে এটিই ছিল প্রধান বিবেচ্য। এর মধ্যে কোনও সুমহান জাতীয় আদর্শ স্থাপন প্রাথমিকভাবে প্রাধান্য পায়নি। ইংরেজদের অনুকরণে থিয়েটার তৈরি করার আগ্রহটি ছিল প্রধান।

কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের এই সমবেত আগ্রহের জেরেই প্রাসাদ-মঞ্চের বাইরে নাট্য সমাজ তৈরি হল। এরকমই একটি উদ্যোগ নিয়ে প্রথম যে গোষ্ঠীটি এগিয়ে এল সেটি হল **মেট্রোপলিটন থিয়েটার**। উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত ‘বিধবা বিবাহ নাটক’ মেট্রোপলিটন থিয়েটারের উদ্যোগে ১৮৫৯ সালের এপ্রিল মাসে সিঁদুরিয়াপটিতে মঞ্চস্থ হল। ইংরেজি এবং সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ মঞ্চস্থ করার যে ধারা সে সময় চালু ছিল, তার থেকে সরে এসে প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক সামাজিক নাটক হিসেবে অভিনীত হয় ‘বিধবা বিবাহ নাটক’। এর আগে অবশ্য রামজয় বসাকের বাড়িতে ১৮৫৭ সালে অভিনীত হয়েছিল রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখিত ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটক।

তবে সেটি ছিল মূলত নকশা জাতীয় একটি নাট্যপ্রয়াস। আচার্য সুকুমার সেন উমেশচন্দ্র মিত্রের নাটকটিকেই প্রথম সামাজিক নাটক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নাটকটি সে সময় সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল।

মহাবিদ্রোহের প্লাবন সারা দেশকে উত্তাল করে চলে যাওয়ার ঠিক পরপরই শহর কলকাতায় বাংলা নাটকের অভিনয় বিভিন্ন আঙ্গিকে এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগে নানাভাবে দানা বাঁধার পথে এগোতে শুরু করে। তবে তার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই কলকাতার অপেশাদার নাট্যচর্চায় জোর কদমে কাজ শুরু করে দিয়েছিল **ওরিয়েন্টাল থিয়েটার**। ১৮৫৩ সালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির দুই প্রাক্তন ছাত্র কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ দত্ত চাঁদা তুলে ৮০০ টাকা সংগ্রহ করে ওরিয়েন্টাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলের প্রাঙ্গণে এই নাট্যমঞ্চ তৈরি হয়েছিল। ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের উদ্যোগে শেক্সপিয়ারের 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত তাঁরা চিৎপুরের গরানঘাটায় অভিনয় মঞ্চস্থ করেন। এঁদের অভিনয় উদ্যোগগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন একদা পার্ক স্ট্রিটে সাড়া জাগানো সাঁ সুসি থিয়েটারের অন্যতম সদস্য মিস্টার ক্লিঙ্গার। 'ওথেলো' ছাড়াও তাঁরা অভিনয় করেন 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস', 'হেনরি দা ফোর্থ' প্রভৃতি নাটক। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরামর্শে কেশব গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখেরা এই থিয়েটারে দেশীয় নাটকের প্রচলনের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসেনি।

প্রাসাদ-মঞ্চের বাইরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত একদল মানুষ এভাবেই কলকাতায় নাট্যচর্চার মান উন্নয়নের জন্য নিজেদের তৈরি করতে শুরু করেন। পেশাদার দক্ষতা অর্জন করতে তারা সাঁ সুসি থিয়েটারের মিস্টার ক্লিঙ্গার ছাড়াও মিসেস এলিস, পার্কার, রবার্টস প্রমুখ ইউরোপিয়ান ব্যক্তিত্বের সাহায্য গ্রহণ করেন। কেশব গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ দত্ত এরপর বেলগাছিয়া নাট্যশালাতেও একসঙ্গে কাজ করেন। বাংলা ভাষায় নাট্যাভিনয়ের দাবিকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারেননি।

সাতকড়ি দত্তের অধ্যক্ষতায় **আরপুলি নাট্যাভিনয় সমাজ** ১৮৬৬ সালে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং নিমাইচাঁদ শীলের লেখা 'এরাই আবার বড়লোক' ১৮৬৮ সালে অভিনয় করে। **বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়** প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৮ সালে বিশ্বনাথ মতিলালের গলিতে গোবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়িতে। এই নাট্যালয়ের উদ্যোক্তা ছিলেন বলদেব ধর ও চুনিলাল বসু। পরবর্তীকালে স্থানীয় মানুষের আগ্রহে এটি বসতবাড়ি থেকে বড় আকারে ২৫ নং প্লটে স্থানান্তরিত হয়।

বাগবাজার নাট্যসমাজ ও **বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারও** এই ১৮৬৮ সালেই কাজ আরম্ভ করে। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশ ঘোষ, অর্ধেন্দু মুস্তাফির মতো উদ্যমী মধ্যবিত্ত তরুণদের গড়া বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার বাংলা নাটকের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। এঁরা দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী' নাটক মঞ্চস্থ করেন। কোনও স্থায়ী নাট্যশালায় অভিনয়ের বদলে তাঁরা ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতেন বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে, রামপ্রসাদ মিত্রের অঙ্গনে, শ্যামবাজারের রাজেন্দ্র পালের বাড়িতে। এই অ্যামেচার দলটির মধ্যবিত্ত অপেশাদার উদ্যোগ সাফল্য পাওয়ায় মধ্যবিত্তদের নাট্য প্রয়াস নতুন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে ওঠে। এরপর তাঁরা নিজেদের অ্যামেচার বা শৌখিন অভিধা ত্যাগ করে **ন্যাশনাল থিয়েটার** নামে পুরোদস্তুর সাধারণ রঙ্গালয়ের অভ্যুত্থান ঘটান। তাঁদের প্রথম অভিনয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' চিৎপুরে মধুসূদন সান্যাল-এর বাড়ির উঠোনে অভিনীত হয়।

দীনবন্ধু মিত্র

এরপর এঁরাই **দ্য ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি** নাম নিয়ে সমিতিবদ্ধ হন। নগেন্দ্রনাথ-অর্ধেন্দুশেখরদের সঙ্গে পরবর্তীকালে এসে যোগ দেন অমৃতলাল বসু। ন্যাশনাল নামটিকে বেছে নেওয়ার মাধ্যমে পেশাদার হওয়ার পাশাপাশি হিন্দু মেলার আদর্শ অনুযায়ী জাতীয় চেতনা ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব প্রকাশের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করাও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমে শিশির কুমার ঘোষের 'নয়শ রুপিয়া', 'ভারতমাতা' মঞ্চস্থ হয় ন্যাশনাল থিয়েটারে। দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রমুখের নাটক একের পর এক মঞ্চস্থ করে ন্যাশনাল থিয়েটার। ন্যাশনাল থিয়েটারে মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনয়ের সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'ডিস্টিঙ্গুইসড অ্যামেচার' হিসেবে এঁদের নাটকে যোগ দেন।

পরবর্তীকালে ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে ওঠে **গ্রেট ন্যাশনাল**, **হিন্দু ন্যাশনিয়ুথেল** প্রভৃতি অভিনয় গোষ্ঠী। তবে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে ভেঙে গেলেও একটি ক্ষেত্রে এই দলগুলি ছিল একমত। কোনও পর্যায়েই এঁরা অপেশাদার আদর্শকে ত্যাগ করেননি। এই একই আদর্শ নিয়ে পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে **বেঙ্গল থিয়েটার**। ১৮৭৩ সালের ১৬ আগস্ট আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ কলকাতার ৯নং বিডন স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠা করেন **বেঙ্গল থিয়েটার**। বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় যাত্রার সূচনা 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দিয়ে। ব্যতিক্রমী বিষয় হল এঁরাই প্রথম নিজস্ব মঞ্চ গড়ে তোলেন, বর্তমানে যেখানে বিডন স্ট্রিট ডাকঘর সেই জমিতে। এক্ষেত্রেও ব্যবসায়িক উদ্যোগ নয়, অপেশাদার আদর্শকে সামনে রেখে নাট্যাভিনয় ছিল মূলমন্ত্র। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ ছিলেন এই নাট্য উদ্যোগের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। পরবর্তীকালে বেঙ্গল থিয়েটারে স্ত্রী ভূমিকায় মেয়েদের অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে ঈশ্বরচন্দ্র সরে দাঁড়ান।

১৮৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল' অর্ডিন্যান্স আকারে জারি করা হয়। এই অর্ডিন্যান্সের কঠোর প্রয়োগে কার্যত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে অপেশাদার মঞ্চ।

এর পরবর্তীকালে সমসময়ের সঙ্গে তাল রেখে জায়মান জাতীয় চেতনার ক্রমস্ফুরণ ঘটে বেঙ্গল থিয়েটার ও **গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে** হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান' প্রভৃতি নাটকে। ১৮৭০ থেকে ১৮৭৬ পর্যন্ত এই নাট্যগোষ্ঠীগুলি একের পর এক অভিনয়ে সামাজিক নাটক ও প্রহসন মঞ্চস্থ করার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনমত উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্রিটিশ শাসক অবশ্যই এই প্রবণতাটি ইতিবাচক মনোভাবের সঙ্গে গ্রহণ করেনি। পুলিশি হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়ে যায় 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসনটির অভিনয়। অপেশাদার মঞ্চ এই পর্বে ক্রমশ ইংরেজ শাসক বিরোধিতার পৃষ্ঠভূমি হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের পক্ষে স্বভাবতই এই ভূমিকা নেওয়া সম্ভব হয়নি।

১৮৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে **'নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল'** অর্ডিন্যান্স আকারে জারি করা হয়। এই অর্ডিন্যান্সের কঠোর প্রয়োগে কার্যত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে অপেশাদার মঞ্চ। 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর স্বত্বাধিকারী ভুবন মোহন নিয়োগী সর্বস্বান্ত হয়ে যান। নাট্যকার উপেন দাস দেশত্যাগী হন। অমৃতলাল বসু, বিহারীলাল প্রমুখ কলকাতা ত্যাগ করেন। অর্ধেন্দু মুস্তাফি, সুকুমারী দত্ত প্রমুখ নট ও নাট্যব্যক্তিত্ব নাট্যাঙ্গন থেকে নিজেদের সরিয়ে নেন। বাংলা নাটকের, বিশেষত অপেশাদার নাটকের অঙ্গন নিষ্প্রদীপ হয়ে পড়ে। মধুসূদন, দীনবন্ধু , জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সৃজন যে নাট্য ঐতিহ্য তৈরি করেছিল, তা আচমকা এই বিপর্যয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। এই শূন্যস্থান দ্রুত পূরণ করতে চলে আসে ব্যবসায়ী মালিকানাধীন থিয়েটার। নাট্যাভিনয় কার্যত লাভ লোকসানের অঙ্কে তৌল হতে শুরু করে। ১৮৮০ সালে ধনবান ব্যবসায়ী প্রকাশচাঁদ জহুরীর নাট্যব্যবসায়ে লগ্নিকারী হিসেবে অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের মতো আরো অনেকে পুরোপুরি ব্যবসায়িক মঞ্চে সমর্পিত হয়ে যান।

শহর কলকাতার কিডনি

সন্দীপ চক্রবর্তী

বিশ্বের অন্যান্য বড় শহরের মতো কলকাতা শহরেও প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর ক্রমবর্ধমান নেতিবাচক প্রভাব অনুভূত হয়ে চলেছে। নগরায়নের কংক্রিটের দাপটের মাঝে সবুজের গালিচা কলকাতা ময়দানকে যদি "শহরের ফুসফুস" বলা যায়, তাহলে শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত জলাভূমিকে “শহরের কিডনি” বলা অত্যুক্তি হবে না। প্রকৃতির এক অপূর্ব উপহার এই পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (East Kolkata Wetlands বা EKW)। ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসা জল-জঙ্গলের সমস্যা আলোচনায় গাছের অভাব নিয়ে সচেতন মানুষ যতটা উদ্বেগ ব্যক্ত করেন, তুলনায় জলাভূমির গুরুত্ব নিয়ে অনেক কম সচেতনতা দেখা যায়। তিলোত্তমা কলকাতায় যে এরকম একটা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, সে বিষয়ে সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার দায়বদ্ধতা থেকে এই লেখা!

East Kolkata Wetlands যেন এক প্রাকৃতিক-ছাঁকনি, যা বর্জ্যকে প্রাকৃতিক উপায়ে পবিশোধিত করে আবার ফিরিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে।

কাস্পিয়ান সাগরের তীরে এক জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র ইরানের রামসার শহরটি। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই শহরে আয়োজিত হয়েছিল এক কনভেনশন! সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় বিশ্বজুড়ে জলাভূমি রক্ষা করার এক মাপকাঠি নির্ধারণের। পরিবেশ ও জনজীবনে জলাভূমির অপরিসীম প্রভাবের কথা মাথায় রেখে বিশ্বজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমির তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমিগুলিকে রক্ষা করার জন্য তাদের “রামসার সাইট” এর মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ২,৫০০-র বেশি রামসার সাইট আছে। আমাদের দেশে আছে ৮৯টি রামসার সাইট। সবচেয়ে বেশি আছে তামিলনাড়ু রাজ্যে — ২০টি। পশ্চিমবঙ্গে আছে ২টি। একটি হল সুন্দরবন ও অপরটি পূর্ব কলকাতা জলাভূমি, যা অনেকে সাধারণ ভাবে পূর্ব কলকাতার ভেড়ি এলাকা নামে জানেন। এই পরিসংখ্যান থেকে পূর্ব কলকাতা জলাভূমির গুরুত্ব বোঝা যায়। ২০০২ সালে এই জলাভূমিকে রামসার সাইট এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। তবে কলকাতা শহরের মুকুটে এই পালক যুক্ত হবার অনেক আগে থেকেই পূর্ব কলকাতা জলাভূমির গুরুত্ব বোঝা গেছে এবং বিভিন্ন সময়ে এই জলাভূমি এলাকা সংস্কারের জন্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

কলকাতা শহরের প্রাকৃতিক ঢাল পশ্চিম থেকে পূর্বে। পশ্চিমে হুগলি নদী ও পূর্বে বিদ্যাধরী নদী। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা শহরের পয়ঃপ্রণালী বাহিত বর্জ্য জল (Sewerage) পূর্ব দিকে বাহিত হয়ে থাকে। আর এখানেই লুকিয়ে আছে প্রকৃতির এক পরম আশীর্বাদ। অসংখ্য ভেড়ি, পুকুর, ডোবা, নালা, চাষের খেত, নিচু জমি নিয়ে প্রায় ১২৫ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই East Kolkata Wetlands যেন এক প্রাকৃতিক-ছাঁকনি, যা বর্জ্যকে প্রাকৃতিক উপায়ে পবিশোধিত করে আবার ফিরিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে। প্রতিদিন প্রায় ৯১ কোটি লিটার অপবিশোধিত বর্জ্য এখানে প্রাকৃতিক উপায়ে পরিশোধিত হয়। এই কাজটি যদি STP (Sewage Treatment Plant) স্থাপন করে করতে হত, তাহলে কোটি কোটি টাকা খরচ হত প্ল্যান্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজে। আর এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সমাধা হচ্ছে স্থানীয় শ্রম কাজে লাগিয়ে। কর্মসংস্থানের নিরিখে এর তাৎপর্য অনেক।

আজ বিশ্বজুড়ে যে 'কার্বন ক্রেডিট' এর প্রচলন হয়েছে, সেক্ষেত্রেও আমাদের পূর্ব কলকাতা জলাভূমি উল্লেখযোগ্য ছাপ ফেলতে সক্ষম।

শহরের নিষ্কাশিত বর্জ্য তো প্রকৃতি নিজগুণে পরিশোধন করে দিল! এবার দেখা যাক এর বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে আর কী কী আমাদেরকে দুহাত ভরে দিচ্ছে ধরিত্রীর এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি! এই প্রাকৃতিক জারণ প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট হয় অগণিত শৈবাল ও প্ল্যাঙ্কটন, যা কিনা মাছের খাদ্য। এর উপর ভিত্তি করে এখানে গড়ে উঠেছে ২৫০ এরও বেশি মাছ চাষের পুকুর। এই এলাকায় বছরে প্রায় কুড়ি হাজার টন মৎস্য উৎপাদন হয় (১ টন = এক হাজার কিলোগ্রাম)! সুতরাং একথা বলা চলে যে, মৎস্যপ্রিয় বাঙালির পাতে মাছ জোগান দেবার ক্ষেত্রে এই জলাভূমি এক বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে। মাছ চাষের পাশাপাশি আছে শাকসবজির চাষ। এই পুরো জলাভূমি এলাকায় প্রতিদিন প্রায় ১৫০ টন শাকসবজি উৎপাদন হয়! গোটা শহরকে টাটকা আনাজ জোগান দেবার ক্ষেত্রে এর চেয়ে দ্রুত সাপ্লাই লাইন আর হয় না! সর্বোপরি কৃষিজীবী মানুষের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অপরিসীম।

খাবার জোগান দেওয়া ছাড়াও পূর্ব কলকাতার জলাভূমি স্পঞ্জের মতো শুষে নেয় শহর থেকে বয়ে আসা প্লাবন। সেজন্যেই বিভিন্ন খালের মাধ্যমে বর্ষার অতিবৃষ্টির জল পূব দিকে এনে ফেলার নগর পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

আজ বিশ্বজুড়ে যে 'কার্বন ক্রেডিট' এর প্রচলন হয়েছে, সেক্ষেত্রেও আমাদের পূর্ব কলকাতা জলাভূমি উল্লেখযোগ্য ছাপ ফেলতে সক্ষম। জলাভূমির স্বাভাবিক ক্ষমতা অনুযায়ী, শহর কলকাতার কার্বন নির্গমনের একটা বৃহৎ অংশ শুষে নিয়ে মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে! অধিকন্তু, শহরের ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে জলস্তর নেমে যাওয়ার যে ভয়াবহ সমস্যা, তাকেও নিঃশব্দে পূরণ করে চলেছে জলাভূমির অসংখ্য ছোট বড় পুকুরের তলদেশের শুষে নেওয়া জল! এইভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাবের আংশিক পাপস্খলন করে চলেছে।

মানুষের কাজে লাগা ছাড়াও বহু পশু পাখির চারণ ও ধারণভূমি এই এলাকা। শীতকালে পরিযায়ী পাখিরা দলে দলে আসে এখানে! যুগ যুগ ধরে এ যে তাদের বহু পরিচিত ঠিকানা! জলবায়ু পরিবর্তনের বিষময় ফল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়ণের চাপে জর্জরিত শহরের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই জলাভূমির গুরুত্ব কী রকম তা বলাই বাহুল্য। তাই একে রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদের। বেআইনিভাবে বা আইনের ফাঁক গলে জলাভূমিতে নির্মাণকার্য, প্রোমোটারি ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে হয়ে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি উদ্যোগে তৈরি হয়েছে Integrated Management Plan of East Kolkata Wetlands. বিভিন্ন রূপরেখার মাধ্যমে চেষ্টা হচ্ছে শহরের লাগোয়া এই প্রাকৃতিক সম্পদকে অটুট রাখার। এ শহরের বাসিন্দাদেরও সচেতন হতে হবে এবং নীতিনির্ধারকদের বাধ্য করতে হবে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়!

তথ্য সংগ্রহ : সন্দীপ চক্রবর্তী

সূত্র: সরকারি পোর্টাল ও ইন্টারনেট

কলকাতা বন্দরের একাল সেকাল

অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে এসেছিল ব্যবসা করতে কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড" রূপে তখন ১৮৭০ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে সঠিকভাবে বাণিজ্য করা এবং বেশি মুনাফার জন্য কলকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন, কারণ তখন স্থলপথ থেকে জলপথ ব্যবস্থাই উন্নত ছিল। হুগলি নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত এটি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম এবং একমাত্র নদীবন্দর। একসময় কলকাতা বন্দরকে পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচনা করা হত। ১৮৭০ সালের অক্টোবর মাস থেকে যখন পোর্ট কমিশনার কাজ শুরু করে তখন কলকাতা বন্দরে জেটির সংখ্যা ছিল মাত্র চার ও মাল খালাসের জন্য ঘাট ছিল মাত্র একটি যেখানে ৫২টি জাহাজ নোঙর করতে পারত।

১৮৯২ সালে খিদিরপুর ডক নির্মিত হয় যেটি কলকাতার তৎকালীন বণিক সম্প্রদায়ের ক্রমাগত দাবির ফল। এর ফলে আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

> চাকুরী জীবনে এখনো পর্যন্ত আমি প্রায় এগারো জন চেয়ারম্যান দেখলাম কিন্তু অনুপ স্যারের মতো চেয়ারম্যান আর দ্বিতীয়টি পাইনি। উনি এবং আমি দুজনেই বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন এর প্রাক্তনী ভেবেই আনন্দে বুকটা ভরে ওঠে।

কলকাতা ডক ব্যবস্থার অধীনে রয়েছে খিদিরপুর ডক এবং নেতাজি সুভাষ ডক। বর্তমানে এই ডক ব্যবস্থাটি মূলত কন্টেনার জাহাজ এবং বার্জসমূহকে পরিষেবা প্রদান করে যদিও বছর দুয়েক আগে পর্যন্ত এখান থেকে নিয়মিত যাত্রীবাহী জাহাজ আন্দামানে যাতায়াত করত। যেহেতু এটি নদীবন্দর তাই এই বন্দরের কাজ নদীর জোয়ার ভাটার উপর নির্ভর করে। বড় জাহাজগুলি ডকে প্রবেশের উদ্দেশ্যে গার্ডেনরিচের নাজিরগঞ্জে নোঙরখানায় অপেক্ষা করে। এখানে একসাথে আটটি জাহাজ নোঙর করতে পারে। নদীর জলতল জোয়ারের প্রভাবে যখন ন্যূনতম ৮ ফুট উচ্চতায় পৌঁছোয় তখন লকগেট ব্যবস্থার মাধ্যমে জাহাজগুলি ডকে প্রবেশ করে। জাহাজ ডক থেকে বেরোবার সময়ও একই পন্থা অবলম্বন করা হয়। স্যান্ডহেডস থেকে কলকাতা বন্দরের মধ্যে নদীপথে কম বেশি ৮০টি জাহাজ ডুবে রয়েছে যেগুলিকে তোলা সম্ভব হয়নি সেইজন্য বাইরে থেকে জাহাজ আসা বা যাওয়ার সময় বন্দরের পাইলটের সাহায্যে নেওয়া হয়। অনুরূপভাবে লক থেকে ডকে ঢোকা বা বেরোনোর সময় ডক পাইলট এবং টাগের সাহায্য নেওয়া হয়।

খিদিরপুর ডকের দুটি অংশ যথাক্রমে কেপিডি ওয়ান ও কেপিডি টু। এখানে মোট আঠারোটি বার্থ এর মধ্যে ১০টি বার্থ কেপিডি ওয়ান এবং আটটি বার্থ কেপিডি টু-এর অন্তর্গত অপরদিকে নেতাজি সুভাষ ডকে দশটি বার্থ আছে।

কলকাতা বন্দরে মোট পাঁচটি ড্রাই ডক আছে যার তিনটি আছে খিদিরপুর ডকে এবং দুটি নেতাজি সুভাষ ডকে, যা জাহাজ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

যেহেতু এটি নদীবন্দর ফলে এখানে জলের নাব্যতার জন্য এবং প্রচুর পলি জমার কারণে জাহাজের আসা যাওয়া কমতে থাকে ফলে ১৯৭৭ সালে হলদিয়াতে আরও একটি ডক নির্মিত হয়। এটিও কলকাতা বন্দরের অন্তর্গত। হলদিয়া ডকে বর্তমানে ১৪টি বার্থ ও তিনটি অয়েল জেটি রয়েছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সাগরদ্বীপে আরো একটি সাগরবন্দর গড়ার কাজ শুরু হয়েছে।

কলকাতা ডক সিস্টেমের মধ্যে দুটি ব্রিজ রয়েছে একটি বাস্কুল ব্রিজ বা নজরুল সেতু যা ১৮৯২ সালে তৈরি অপরটি সুইং ব্রিজ যা ১৮৯৫ সালে তৈরি হয়। দুটি ব্রিজই ভীষণ সুন্দর এবং অবশ্যই দেখার মত। জাহাজ যখন কেপি ডক থেকে মেন ডকে প্রবেশ করে তখন সুইং ব্রিজটি ৯০ ডিগ্রি ঘুরে আইল্যান্ডে আসে ফলে দুটি রাস্তা তৈরি হয় একটি বড়-আলা এবং অপরটি ছোট-আলা নামে পরিচিত। জাহাজ মেইন ডকে প্রবেশ করার পর আবার ব্রিজটিকে যথাস্থানে নিয়ে আসা হয় এবং গাড়ি যাতায়াতের উপযুক্ত করে দেওয়া হয়। কলকাতার লোক সেভাবে এটির কার্যকলাপ না দেখলেও বিহার উত্তরপ্রদেশের লোকেরা গঙ্গাসাগর দর্শনের জন্য বাবুঘাটে এলে ট্যাক্সিওয়ালাদের কল্যাণে অবশ্যই এই ব্রিজটি দর্শন করেন। আমি অনেক মহিলাকে এই ব্রিজে “গঙ্গা মাইয়া কি জয়” বলে পয়সা ছুঁড়তেও দেখেছি।

মহানায়ক উত্তমকুমার কলকাতা বন্দরে চাকরি করতেন।

ব্রিজটি হাইড্রলিক পদ্ধতিতে চলে।

এ বিষয়ে একটি মজার ঘটনা বলি। আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে তখন আমরা বেশ কয়েকজন কলকাতা বন্দরের চাকরিতে নতুন জয়েন করেছি। তখন তো আর এখনকার মতো মোবাইল ছিল না।

একদিন আমি আমার ইয়াসিকা ক্যামেরায় রিল ভরে অফিসের বন্ধুদের নিয়ে নানারকম ভঙ্গিমায় এই ব্রিজের ওপর ছবি তুলছি। হঠাৎ কোথা থেকে যমদূতের মত সি.আই.এস.এফ জওয়ান হাজির হয়ে আমাদের কাছ থেকে ক্যামেরা কেড়ে নিলেন। ছবি তোলা বারণ জানতাম তবে ভেবেছিলাম আমরা তো বন্দরে চাকরি করি, আমাদের ছাড় আছে কিন্তু যমদূত ছাড়ছেন না উল্টে অ্যারেস্ট করার ভয় দেখাচ্ছেন। অনেক কাকুতিমিনতি করে ক্যামেরা থেকে রিল খুলে ওনার হাতে দিয়ে তবে নিস্তার পেয়েছিলাম। ছবি তোলা এখনো বারণ তবে মোবাইলের যুগে ছবি তোলা রুখবে তা কার সাধ্য!

জাহাজ বা বার্জকে কেপিডি ওয়ান থেকে কেপিডি টু-তে ঢুকতে গেলে আবার একটা ব্রিজ পেরোতে হয় যা বাস্কুল ব্রিজ নামে পরিচিত। ব্রিজটি মাঝবরাবর দু'ভাগ হয়ে উপরে উঠে যায়, জাহাজ চলে যাবার পর আবার ব্রিজটিকে

জুড়ে দেওয়া হয় এবং তার ওপর দিয়ে বাস, লরি, গাড়ি চলাচল করে। এটিও হাইড্রলিক পদ্ধতিতে চলে। এই ব্রিজটি খিদিরপুরের সাথে গার্ডেনরিচকে যুক্ত করেছে। বর্তমানে জাহাজ বা বার্জ পারাপারের জন্য শুধুমাত্র সকাল আটটা থেকে সকাল সাড়ে নটা পর্যন্ত ব্রিজটি খোলা হয়। এই দুটি ব্রিজ কলকাতার বিশেষ দ্রষ্টব্য। এরকম ব্রিজ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এছাড়াও এনএসডি তে ২০০ টন একটি ক্রেন আছে যা একসময় এশিয়ার বৃহত্তম ক্রেন ছিল। বর্তমানে অবশ্য জাহাজেও এর চেয়ে বড় এবং ভারী ক্রেন থাকে।

২০০২ সালে কলকাতা বন্দর যখন আর্থিক ক্ষতিতে চলছিল তখন তৎকালীন চেয়ারম্যান বলেছিলেন কর্মচারীদের স্যালারি ঠিকমতো দেওয়া যাবে না, প্রয়োজনে অন্য বন্দরে কর্মচারীদের বদলি করা হবে। আমাদের তো সবার মন খারাপ! এরপরই ২০০২ সালের জুন মাসে চেয়ারম্যান হিসেবে জয়েন করেন আমাদের স্কুলেরই প্রাক্তনী মাননীয় অনুপ কুমার চন্দ মহাশয়। তিনি এসে প্রথমেই মাসের শেষ দিনে কর্মচারীদের স্যালারির ব্যবস্থা করে দেন এবং বন্দরের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, চাকুরী জীবনে এখনো পর্যন্ত আমি প্রায় এগারো জন চেয়ারম্যান দেখলাম কিন্তু অনুপ স্যারের মতো চেয়ারম্যান আর দ্বিতীয়টি পাইনি। উনি এবং আমি দুজনেই বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন এর প্রাক্তনী ভেবেই আনন্দে বুকটা ভরে ওঠে।

ভাবতে ভালো লাগে মহানায়ক উত্তমকুমার কলকাতা বন্দরে চাকরি করতেন।

২০২০ সালে বন্দরের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী "কলকাতা বন্দর সংস্থা"-র নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট কলকাতা।

কলকাতায় মাঝেরহাট ব্রিজের কাছে বন্দরের শতবার্ষিকী হাসপাতাল আছে যেখানে বর্তমান এবং প্রাক্তন কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ সমস্ত রকম চিকিৎসার সুযোগ পান। কোভিড অতিমারীর সময় অন্যরা যখন হাসপাতালে বেড এবং অক্সিজেনের অভাবে মৃতপ্রায় তখন আমরা বন্দর পরিবারের লোকরা ভীষণ সুরক্ষিত ছিলাম। সে সময় হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও কর্মীরা অসাধারণ পরিষেবা দিয়েছিলেন। এর জন্য কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।

বর্তমানে বন্দরে বেসরকারিকরণ চলছে। অনেক বার্থ বেসরকারি সংস্থার হাতে চলে যাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের মতো স্থায়ী কর্মচারীর তুলনায় চুক্তিভিত্তিক কর্মীসংখ্যা বেশি তবুও কলকাতা বন্দর লাভের মুখ দেখছে এটাই আনন্দের খবর।

এভাবেই কলকাতা বন্দর বেঁচে থাকুক এই আশা রাখি।

কোন্ বাংলায় লিখব?

সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়

এবারের ‘খেয়া’ পত্রিকার কলকাতা সংখ্যায় কলকাতার ভাষা – বাংলা বিষয়ে কিছু লিখব ঠিক করলাম। লিখতে গিয়ে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লাম, এটা সাধু ভাষায় লিখব না চলিতে? লেখ্য চলিতে লিখব নাকি মুখের ভাষা কথ্য চলতি ভাষায়? যদি মুখের ভাষায় লিখি, তবে কোন্ উপভাষায় লিখব – পূর্ববঙ্গীয়, বরেন্দ্রী, রাধিকী না রাঢ়ীতে?

এইসব ভাবতে গিয়ে লেখা দিতে ক্রমাগত দেরি করছি। সম্পাদকমশাই কথা বলাই বন্ধ করে দিলেন। তখন চটজলদি মান্য (standard) বাংলাকে বাহন করে লেখা শুরু করে দিলাম। এই বাংলাভাষাই তো আজকের লেখ্য বাংলা। আধুনিক চলিত ভাষা। এর মা জননী মূলত কলকাতা, নদিয়ার মধ্যবঙ্গীয় লেখ্যভাষা। আর এটাই আমাদের বর্তমান কলকাত্তাই ভাষা। আমাদের সাহিত্যের ভাষা, আমাদের প্রশাসনিক কাজের ভাষা, আমাদের বক্তৃতার ভাষা।

১৯৩৫-১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও বানান সংস্কার কমিটি চলিত ভাষার ভিত্তিতে একটি প্রমিত লেখ্য রূপ নির্মাণের সুপারিশ করে। পরবর্তীতে বাংলা আকাদেমি তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বভার নিয়ে অনেক কাজ করেছে এবং করে চলেছে। বানানবিধি, পরিভাষা নির্মাণ, নির্ধারিত ব্যাকরণ অনুসরণ, শব্দচয়নে বিশুদ্ধতা আনা – এসব কাজ করে উপহার দিয়েছে এক মান্য (standard) বাংলা। তৎকালীন সেই ভাষা কমিটিতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বা সুকুমার সেনের মতো ভাষাবিদ্ যেমন ছিলেন, ছিলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য বা রাজশেখর বসুর মতো বিজ্ঞানী-সাহিত্যিকরা, ভাষাচিন্তক মাহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভাষাবিদ্ ও গণিতজ্ঞ দেবপ্রসাদ ঘোষ, ছিলেন বিনয় সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা। আর একরকম উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবপ্রসাদ ঘোষের ‘বাণান কমিটিতে ঘন্টা কয়েক’ নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পর্কে পাই, “এমন সময়ে কবিবর রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আর্জি পেশ করিলেন যে বাঙ্গালা ভাষায় যে চলতি ভাষার মৌখিক রূপ আজকাল কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত মাত্রাতেই সাহিত্যে চালু হইয়াছে, সেই রূপগুলির বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া standardize করিবার চেষ্টা করা হউক। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ণধারগণ আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এই পরিভাষা কমিটিরই উপর বাঙ্গালা বাণান নিয়ন্ত্রণের ভারও চাপাইয়া দিলেন। নানাবিধ অভিনব প্রস্তাবাবলী-সমন্বিত একখানি পুস্তিকা বাহির করিলেন ১৯৩৬-এর মে মাসে। অক্টোবর মাসে বাহির হইল এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংস্করণ। কবি রবীন্দ্রনাথ ও ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এইসব প্রস্তাবে অনুমোদন স্বাক্ষর করিয়াছেন।” বানান সংস্কারে মতানৈক্যও কম হয়নি। রক্ষণশীল দেবপ্রসাদ ঘোষ

> দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্র-পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ‘পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি’ প্রতিষ্ঠিত হল।

শুধু সুনীতিকুমার, শহীদুল্লাহ, রাজশেখর বসু বা চারুচন্দ্রের সঙ্গেই বচসা করেননি, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন।

দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্র-পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' প্রতিষ্ঠিত হল। পূর্ব পাকিস্তানে ড. এনামুল হকের নেতৃত্বে 'বাংলা একাডেমি' প্রতিষ্ঠিত হয়। একটা মান্য বানানরীতি (Orthography) তৈরি করেছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। বহু খণ্ডে বাংলা অভিধান প্রকাশ করেছে। এদের বানানরীতিই মান্য অর্থাৎ আমাদের মেনে চলা উচিত। অবশ্য আধুনিক বানানধারা মানতে আজও অনেকেই গররাজি রক্ষণশীল মন থেকে। পুরাতন ও আধুনিকের প্রভাবে তারা যেমন খুশি বানান লিখতে থাকেন। আধুনিক বানানধারার পিছনে যে যুক্তি ও নিয়ম আছে তা তারা বুঝতেও চান না, শিখতে তো চানই না।

বানান নিয়ে একটা স্পষ্ট নিয়ম আনন্দবাজার পত্রিকাও মেনে চলে এবং সেটা আধুনিকও বটে। একসময় পশুপতি রায় বানানের সরলীকরণ এবং একরূপতা আনতে সচেষ্ট ছিলেন। বিজয়চন্দ্র মৈত্র আনন্দবাজারের বানান সংস্কারে একটা সুস্পষ্ট স্টাইল গাইড চালু করেন। এছাড়া সম্পাদক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'যথাযথ চলিত রীতি' বজায় রাখার ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন' নামে একটা সরল আধুনিক বানান বিষয়ে নির্দেশক গ্রন্থও রচনা করেন।

চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাল থেকে সাহিত্যের ভাষা প্রায় আটশো বছর ধরে বিবর্তিত হতে হতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিছুটা পরিশীলিত আধুনিক রূপ অর্জন করে।

যাই হোক, মান্য বাংলা একদিনে গড়ে ওঠেনি। এই প্রমিত বা মান্য বাংলায় পৌঁছতে অনেক দুর্গম গিরি দু:সহ পারাবার পেরিয়ে এসেছে বাঙালি। মূলত সাহিত্যিক, বৈয়াকরণ এবং বানান ও ভাষা সংস্কারকদের হাতেই বাংলা বিবর্তিত এবং পরিশীলিত হতে হতে এসেছে। ভাষার এই আধুনিক রূপ চিরকাল এমনটি ছিল না। চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাল থেকে সাহিত্যের ভাষা প্রায় আটশো বছর ধরে বিবর্তিত হতে হতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিছুটা পরিশীলিত আধুনিক রূপ অর্জন করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে গদ্যের সূচনা হয়েছিল ইউরোপীয়দের হাতে, পরবর্তীতে সেটাই আধুনিক রূপ পায় রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে। শ্রীপান্থের গ্রন্থে পেয়েছিলাম পাগলা ফরস্টার সাহেবের কথা। ইংরাজী বাংলা অভিধান (১৭৯৯-১৮০২) শুধু লেখেনইনি, সব কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহারের দাবি তিনিই প্রথম করেন। শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম পণ্ডিত উইলিয়াম কেরিকে একবার স্মরণ করতেই হবে। তাঁর মুন্সি রামরাম বসুর কাছে বাংলা অধ্যয়ন করেন তিনি এবং মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। বাংলা গদ্যের সূচনা পর্বে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন এই সাহেব। কেরি-মার্শম্যানের উদ্যোগে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের বার্তা নিয়ে

এসেছিল। বিস্তারিত করব না, শুধু কেরি সংকলিত 'কথোপকথন' (১৮০১ সালে) গ্রন্থখানির কথা উল্লেখ করব বাংলা ভাষার আধুনিকতার সোপান হিসেবে। 'কথোপকথন'-এ হাস্যপরিহাস, গ্রাম্যতা, অশ্লীল গালাগাল, মেয়েলি কোন্দল, প্রাত্যহিক জীবনের উপাদেয় বর্ণনা আছে শিক্ষার উদ্দেশ্যে। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের আগে বাংলা গদ্যকে একটা আধুনিক রূপদান করেন মৃত্যুঞ্জয়ই। তাঁর লেখা 'রাজাবলি' থেকে অসামান্য আধুনিক গদ্যের নমুনা দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। "মোরা চাষ করিব, ফসল পাবো, রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে, তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাব, ছেলেপিলেগুলি পুষিব। – শাকভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই, সেদিন তো জন্মতিথি।"

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বাংলা গদ্য সাহিত্যে বাংলা ভাষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক মাইলস্টোন। আধুনিক বাংলা ভাষার অন্যতম রূপকার প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, "হুতোম প্যাঁচার নকশা হচ্ছে তখনকার সমাজের আগাগোড়া বিদ্রূপ এবং অতি চমৎকার লেখা। এ বই সে কলকাতা সহরের চলতি ভাষায় লেখা। এ ধরনের চতুর গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় আর দ্বিতীয় নেই।" লোকের মুখচলতি ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠাকে মেনে নিতে পারেননি বঙ্কিমচন্দ্র, লিখেছেন, "হুতোমী ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমী ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে।" তাঁর প্রিয় বরং টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'। অনেকেই মান্য বাংলার সূচনা 'আলালের ঘরের দুলাল' বইয়ের মধ্যে খুঁজে পান।

আধুনিক বাংলা গদ্য এবং ভাষা নির্মাণের অন্যতম প্রধান কারিগর নি:সন্দেহে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কর্মকুশলতা দান করিয়াছেন – এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন – কিন্তু যিনি সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথম তাঁহাকে দিতে হয়।"

বিদ্যাসাগর শিক্ষা সংস্কারক ছিলেন। ১৮৫৪ সালে বাংলাদেশে ছোটলাট হ্যালিডে বাংলাশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত একটি 'মিনিটে' ব্যক্ত করেন। হ্যালিডে তাঁর বিখ্যাত 'মিনিটে'র প্রেরণা পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। সে সময় শিক্ষার উপযুক্ত বাংলা পুস্তকের অভাব এবং শিক্ষকের অভাব বিদ্যাসাগর অনুভব করেছিলেন। সে দায়িত্বও তিনি ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন। আধুনিক বানান সংস্কারের কাজও শুরু করেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে রেফ-এর পর দ্বিত্ব বর্জনের সুপারিশ করে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম এই সংস্কারের প্রস্তাব করে যান। বাংলা বর্ণমালা নিয়ে তাঁর কাজ তো অবিস্মরণীয়। সুতরাং আজকের মান্য বাংলাপ্রতিষ্ঠা বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকর্ম, বানানসংস্কার এবং বাংলা ভাষা প্রসারের বিপুল কর্মোদ্যোগ ছাড়া সম্ভব হত না।

বিদ্যাসাগরের পর বাংলা ভাষা সংস্কারের যথার্থ দায়িত্বপালন করেন রবীন্দ্রনাথ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ রবীন্দ্র-যুগ। তাঁর বিশাল ছায়ার নীচেই শুরু হয় ভাষা সংস্কারের কাজ। রবীন্দ্রনাথের সুপারিশেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথকে লেখা দেবপ্রসাদ ঘোষের অনুযোগ-পত্রখানির একটা অংশ উল্লেখ করি, "আপনি বাণানের নববিধান মানিবার রাজী-নামা দস্তখত করিয়াও কেন নিজের লেখায় উহা পালন করিতেছেন না, এই অনুযোগকারী জনৈক পত্রলেখকের উত্তরে আপনি যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাও আমি একদিন 'প্রবাসী' অফিসে বসিয়া দেখিয়াছি এবং আপনার সুরসাল মন্তব্যটি – "নিয়ম পরিবর্ত্তন সহজ, অভ্যাস পরিবর্ত্তন সহজ নহে" – পড়িয়া খুবই উপভোগ করিয়াছি। কিন্তু এ বিষয়ে আপনার প্রতি আমার একটু অনুযোগ আছে। যে অভ্যাস কু-অভ্যাস নহে, তাহা যে খাম্‌খা পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে – ইহা আপনি মানিয়া লইলেন কেন? আপনার এই apologetic attitude সম্বন্ধেই আমার অনুযোগ।" এসব অনুযোগ-অভিযোগ কালের গর্ভে তলিয়ে গেছে। কিন্তু ভাষা ও বানানের সংস্কারসাধনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনা পরিণতি পেয়েছে। ভাষায় আমরা কিছুটা আধুনিক ও ঋদ্ধ হয়েছি।

কয়েক টুকরো কলকাতা - একটি কোলাজ

শান্তনু চ্যাটার্জি

"এ কী গভীর বাণী..."

বসন্তের বিকেলে বসন্ত কেবিনে বসে দু'জন, মুখোমুখি। পৃথিবীর দুই গোলার্ধের দুজন মানুষ। কল্পনাকে রূপ দেওয়া যাদের কাজ। ফরাসি আভঁ গার্দ ধারায় অভিষিক্ত চিত্র পরিচালক জঁ রেনোয়া আর বাস্তবের দগদগে ক্ষতকে পরাবাস্তবের আঙিনায় তুলে নিয়ে আসা শিল্পী কমল কুমার মজুমদার। রেনোয়া কলকাতায় এসেছেন 'দ্য রিভার' সিনেমার শ্যুটিং করতে। একে একে পরিচিত হয়েছেন বংশীচন্দ্র গুপ্ত, হরিসাধন দাশগুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, যুবক সত্যজিৎ রায় ও আরও কয়েকজন চলচ্চিত্র বোদ্ধার সঙ্গে।

'দ্য রিভার' ছিল কোনও বিখ্যাত পরিচালক নির্মিত প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র যা কলকাতায় শুটিং করা হয়েছিল। সেই কারণে তৎকালীন কলকাতার চলচ্চিত্র জগতে এই সিনেমার একটা আলাদা গুরুত্ব ছিল। পরিচালক রেনোয়া উপরোক্ত কুশলীদের নিযুক্ত করেছিলেন এই চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজে। এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মানুষটি হলেন কমল কুমার মজুমদার। যাঁর কাছে রেনোয়া বাংলা তথা এই উপমহাদেশের সংস্কৃতি, জীবনধারা ইত্যাদি মূল বিষয়গুলির পাঠ নিয়েছিলেন।

কলকাতার বুকে বসন্ত কেবিনের এক কোণের টেবিলে বসে কাটলেটে কামড় দিতে দিতে কমল বোঝাচ্ছিলেন ঘাটের কথা, নদীর সঙ্গে নদী পাড়ের মানুষের সুখ দু:খের আদানপ্রদানের কথা, অব্যক্ত ভালোবাসা ও অভিমানের কথা। এক ফরাসি শিল্পীর অনুসন্ধিৎসাকে তৃপ্ত করছে তৎকালীন বাংলার 'লেখকের লেখক'; গোলাপ সুন্দরীর জন্মদাতা কমলকুমার মজুমদার — সাক্ষী রইল কলকাতা।

"দেখা হয়েছিল... কী জানি কী মহা লগনে"

গ্র্যান্ড হোটেল থেকে বেরিয়ে এসপ্ল্যানেডের গুটপাথ ধরে হেঁটে চলেছেন দুই সুদর্শন পুরুষ। গন্তব্য ফার্পো হোটেল, উদ্দেশ্য কফি খেতে খেতে আড্ডা, বিষয় চার্লি চ্যাপলিন অথবা হলিউড ফিল্মের উপর ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রভাব। হলিউডের বিখ্যাত সিনেমা গডফাদার খ্যাত মার্লন ব্র্যান্ডো কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর কলকাতায় অবস্থানকালের মধ্যে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আলাপ ও আলাপচারিতা। তিনি কলকাতায় এসে উঠেছিলেন গ্র্যান্ড হোটেলে। নিজের উদ্যোগে সত্যজিৎ রায়কে আমন্ত্রণ করেছিলেন গ্র্যান্ড হোটেলে। সত্যজিৎ সাড়া দিলেন,

এলেন গ্র্যান্ড হোটেলে। বিশ্ব-সিনেমা চর্চার অগ্রগন্য আদ্যপান্ত বাঙালি শিল্প মননের দীর্ঘাকার মানুষটি অভিভূত করলেন ব্র্যান্ডোকে। আলোচনা চলতে চলতে এক সময় একটু কফি বিরতির তাড়নায় তাঁরা চললেন ফার্পো হোটেলের দিকে। তাঁদের যুগল পদচারণায় ধন্য হল এসপ্ল্যানেডের ফুটপাথ। সমৃদ্ধ হল কলকাতা।

কবেকার কলকাতা

পূর্ব ভারতে ভ্রমণ ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সিকিম থেকে নানান পথ ঘুরে তৎকালীন সিলেট (শ্রীহট্ট) থেকে একেবারে বড়বাজার অঞ্চলে এসে প্রায় এক পক্ষকাল কলকাতায় থেকে গেলেন শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম শিখ গুরু, গুরু নানক। সেটা ছিল ১৫১০ সাল। সে সময় ওই অঞ্চলে মহামারী চলছিল। গুরু নানক আর্তের সেবা করেন। শিখ ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যে এবং বড়বাজার অঞ্চলের স্থানীয় সূত্রে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কলকাতা নামটিও পাওয়া যায় যদিও জোব চার্নক জন্মগ্রহণ করবেন আরও এক শতাব্দীরও অধিক কাল পরে।

ওই ষোড়শ শতকেরই শেষের দিকে (১৫৯০ থেকে ১৫৯৬) ঐতিহাসিক আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে কলকাতার উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে বিশেষ ধর্মীয় স্থান হিসাবে, কালীঘাটের কালী মন্দিরের জন্য। এর পর ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গির এই অঞ্চলের জাগিরদারি অর্পণ করেন সাবর্ণ রায়চৌধুরির বংশের হাতে। শোনা যায়, কালীঘাটের পাশে প্রবাহিত গঙ্গার খাল তখন অনেক চওড়া ছিল এবং কালীঘাট থেকে ওই খালের পাশ দিয়ে একটা পথ ছিল; এই পথই বেহালা- বড়িশা অঞ্চলের সঙ্গে কালীঘাটের যোগাযোগের মাধ্যম ছিল। বর্তমান উত্তর কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গেও কালীঘাটের যোগাযোগের রাস্তা ছিল বলে শোনা যায়। এই কালী মন্দিরের জন্যই প্রাচীন কালিকাটা বা কালিকাত্তা থেকেই পরবর্তী কালে কলকাতা নামের উৎপত্তি, এ রকম একটি মত ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ১৪৯৫ সালে বিপ্রদাস পিপলাই লিখিত মনসামঙ্গল কাব্যেও কলকাতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিধবা বিবাহ

আরেক কালী মন্দির হল ঠনঠনিয়া। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির কাছে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে সেদিন এক আশ্চর্য ধুমধাম। শীতের সন্ধে গড়িয়ে রাতের দিকে চলেছে আর রাজেন বাঁড়ুজ্যের ওই বাড়িতে তখন নহবতে সানাইয়ের সুর। লগ্ন বিচার করে এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে সৃষ্টি হল এক ইতিহাস। হিন্দু সমাজে সেই প্রথম এক বিধবা রমণীর মুঝে যাওয়া সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিল শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, এক বর্ণহিন্দু সন্তান। বর্ধমানের বালবিধবা কালীমতির জীবন চরম অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেল। নতুন জুটি তাদের সমস্ত আবেগ নিয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল দুটি খড়ম পরা পায়ে। বিদ্যাসাগর প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন নবদম্পতিকে, মানবতার জয় হল। ধন্য হল কলকাতা।

৭৬ নয় ১৮

কলকাতা শহরের বইমেলার গুরুত্ব, ইতিহাস এবং বইমেলার জনপ্রিয়তার কথা সকলেই জানে। ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসের ৫ তারিখ কলকাতা শহরে প্রথম বার পুস্তক মেলা শুরু হয় বলেই আমরা জানি। এই মেলার প্রবেশ মূল্য ছিল ৫০ পয়সা। প্রথমবারের মেলায় ৫৬টি স্টল ছিল ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য বাঙালির অজানা নয়।

কিন্তু, এটাই কি ছিল কলকাতার প্রথম বইমেলা? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়তো অনেকেরই জানা নেই। ঔপনিবেশিক ভারতে ১৯০৫ সালে স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের অন্যতম বিষয় ছিল বিদেশি দ্রব্য বর্জন এবং জাতীয়বাদের প্রসার। এই আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে ১৯০৬ সালে গঠিত হল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education -- NCE)। ১৯১৮ সালে এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্বদেশি আন্দোলনে একটি নতুন মাত্রা যোগ করল। বই ও প্রকাশনা জগতের আঁতুরঘর কলেজ স্ট্রিটে আয়োজিত হল একটি পুস্তক ও শিল্প মেলা। এই অভিনব ও উল্লেখযোগ্য বইমেলা আয়োজনের তত্ত্বাবধানে ছিলেন নীলরতন সরকার, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মনীষীরা। কলকাতার মেধা ও মনন এ ভাবেই আমাদের বারেবারে চমকে দিয়েছে।

সাহেবিয়ানা বিলিতি খানা

চমকে উঠেছিল কলকাতা তথা সারা বাংলা, সেটা ছিল ১৭৭৫ সাল। সে বছর জুন মাসে ফোর্ট উইলিয়ামসে অবস্থিত তৎকালীন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি লর্ড এলিজা ইমপে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ জারি করেন। এই বিচার ও রায় বিতর্কিত ছিল; রায় সংশোধনের জন্য প্রচুর প্রস্তাব ও আবেদন আসা সত্ত্বেও ইমপে সেই রায় বহাল রাখেন। ৫ অগাস্ট ১৭৭৫ সকালে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। সারা বাংলা উত্তাল হয়ে উঠেছিল। এটাই ছিল ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় প্রথম কোনও ভারতীয়র ফাঁসি। এই বিচারপতি এলিজা ইমপে থাকতেন চৌরঙ্গি থেকে পুবদিকে যে রাস্তা কবরখানার দিকে গিয়েছিল সেই রাস্তার আশেপাশে। তখন এই রাস্তার নাম ছিল বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোড, একাধিক কবরখানার অবস্থানই ছিল এই নামের কারণ। অপেক্ষাকৃত জনবিরল এই অঞ্চলে তখন ঝোপঝাড় ও জঙ্গল ছিল। প্রচুর হরিণ ছিল এ অঞ্চলে। পশুপ্রমী স্যার এলিজা ইমপে এখানে একটি ডিয়ার পার্ক তৈরি করেছিলেন। সেই থেকেই পরে এ রাস্তার নাম হল পার্ক স্ট্রিট--কলকাতা শহরের জৌলুসের ভরকেন্দ্র। এই রাস্তার কাছেই চৌরঙ্গির উপর বর্তমান গ্র্যান্ড হোটেলের কাছে উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে অ্যাঞ্জেলো ফারপো নামের এক ইতালি ফারপো'জ হোটেল চালু করেন।, অবশ্য এর আগে ১৮৭০ সাল থেকেই রাজভবনের কাছে অধুনা বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে পেলিতি'স রেস্টুরেন্ট খুব বিখ্যাত ছিল। প্রথমে চা-কফি, কনফেকশনারি ইত্যাদি দিয়ে শুরু হলেও পরে পরিপূর্ণ রেস্টুরেন্ট হিসাবে কলকাতার উপরতলার মানুষজনের কাছে পছন্দের জায়গা ছিল। তবে সার্বিক ভাবে পরিপূর্ণ এক হোটেল বলতে খুব সম্ভবত এই ফারপো'জ-ই ছিল কলকাতার প্রথম নাম। ড্যান্স

ফ্লোর,ক্যাবারে, নাইট লাইফ, উমদা খানাপিনা সব মিলে কলকাতার সম্ভ্রান্ত মহলের প্রথম পছন্দ ছিল এই ফারপো'জ হোটেল। এরপর আস্তে আস্তে এই পার্ক স্ট্রিট হয়ে উঠল রেস্টুরেন্ট, নাচা-গানা, মদ্যপান ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের স্ফূর্তির প্রাণকেন্দ্র। মুল্যাঁ রুজ, স্কাই রুম, বার-বি-কিউ, ম্যাগনোলিয়া ট্রিঙ্কা'জ থেকে ম্যোকাম্বো, ফ্লুরি'জ, ওয়ালডর্ফ, পিটার ক্যাট--রাতের ঝলমলে আলো, গানবাজনা, হুল্লোড় সব মিলিয়ে যেন এক অন্তহীন মজলিশের অনন্ত আয়োজন।

কলকাতার ফুটবল মাঠের মেঠো কথা

সঞ্জয় মুখার্জি

কলকাতার ঘেরা মাঠের সাথে আমার পরিচয় ৭০-এর দশকে. তখন যেদিন ইস্টবেঙ্গলের লিগের খেলা থাকত, একজন আমাকে ট্যাক্সি করে নিয়ে যেতেন কসবা থেকে আর পথে ঢাকুরিয়া ব্রিজের কাছ থেকে সেই ট্যাক্সির সামনে বসতেন ইস্টবেঙ্গলের রাইট ব্যাক শান্তি সাহা মহাশয়। উনি ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড় জানতাম তবে অনেক পরে ওঁর পড়ন্ত বেলায় বিবেকানন্দ পার্কে দীর্ঘদিন সকালে ওঁর সাথে ফুটবল খেলতে গিয়ে বুঝেছি কেন উনি ভারতীয় যুব দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন।

তবে সেই ৭০-এর দশকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের টেন্টের ভিতরের একটু খোলা জায়গায় একটা গাছের নীচে খেলার পর খালি গায়ে বিশ্রামরত অবস্থায় যাদের দেখেছি তাদের তখনই ভারতীয় দলের জার্সি পরা হয়ে গেছে। টিম মাঠে নেমে যাওয়ার পর আমাকে যিনি মাঠে নিয়ে যেতেন তিনি খেলোয়াড়দের ম্যাসাজ করতেন, আমাকে নিয়ে সাইড লাইনের ধারে বসতেন।

> ..."পৌঁছেই কমিটির থেকে টাকা নিয়ে দিয়ে দেব"। উনি কখনোই বলতেন না যে খেলোয়াড়দের দেবার মতন টাকা ওঁকে দেওয়াই হয় নি।

প্রাণ ভরে খেলা দেখেছি অনেকদিন। দর্শকদের উন্মাদনা কী জিনিস দেখেছি সেটাও। তবে অনেক পরে বিবেকানন্দ পার্কে প্রায় রোজ সকালে ফুটবল খেলার জন্য আরও অনেক ময়দানের ঘেরা মাঠের প্রাক্তনীকে পেয়েছি, তাদের সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়ে বুঝেছি যে তারা তাদের বেড়ে ওঠার সময় খেলার মাঠকে উজাড় করে দিয়েছেন আর মাঠও তাদের বঞ্চিত করেনি।

খেলার মাঠের অফুরন্ত গল্প, বিভিন্ন টুর্নামেন্টে তাদের খেলতে যাওয়ার গল্প, বাড়ি থেকে রাশভারি বাবাকে ফাঁকি দিয়ে মাকে সব কবুল করে ট্রেন ধরতে চলে যাওয়ার নানারকম ঘটনা তারা বলেছেন কথার পিঠে আর আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনেছি তাদের সেইসব দিনের কথা। ভারতীয় দলে বিভিন্ন বিদেশি কোচদের আগমনের সূত্রে, সেই সময়ের ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের মুখে সেইসব কোচদের নিয়ে কথা শুনেছি, তখন অবশ্য তারা প্রাক্তন হয়ে গেছেন।

এইসব গল্পের ফাঁকে উঠে এসেছে বিভিন্ন ক্লাবের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের কাহিনি, সেগুলোও যথেষ্ট কৌতুকে ভরা।

ময়দানে ঘেরা মাঠের কর্মকর্তা আর যারা ছোট দলের কর্মকর্তা তাদের মধ্যে খেলোয়াড়দের নিয়ে যে ছেলেখেলা ৭০-এর দশকে প্রচলিত ছিল, সে সব গল্পের ছলে ময়দানের খেলোয়াড়রাই জানিয়েছেন।

এক ছোট ক্লাবের কর্মকর্তা যার সাথে সেই সময় সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সর্বেসর্বা জিয়াউদ্দিন মহাশয়ের খুবই দহরম মহরম ছিল। অনেক টুর্নামেন্টে বাইরের রাজ্যে ওঁর টিম খেলতে যেত, কিন্তু যাতায়াতের টিকিট কাটার পরে হাত খরচ দেবার সময়, মিটিংয়ে খেলোয়াড়দের সামনে নিজের ডানহাতকে খুব বলতেন কেন এখনও এদের টাকা দেওয়া হয় নি। উনি তারপর অল্প কিছু খেলোয়াড়দের (তাও সবাইকে নয়, যারা টিমকে মাঠে টানে, তাদের) টাকা দিয়ে বাদবাকিদের বলতেন, "পৌঁছেই কমিটির থেকে টাকা নিয়ে দিয়ে দেব"। উনি কখনোই বলতেন না যে খেলোয়াড়দের দেবার মতন টাকা ওঁকে দেওয়াই হয় নি। এটা ওই ক্লাবে খেলা এক প্রাক্তন খেলোয়াড় অনেক পরে জানিয়েছিলেন মাঠের আড্ডায়।

এবার আসি ঘেরা মাঠের অতি পরিচিত এক কর্মকর্তার ব্যবহারে. তাঁকে নিয়ে ময়দানে অনেক গল্প আছে, কিন্তু ওই ক্লাবে খেলা এক প্রাক্তনী জানিয়েছিলেন যে ওঁর পক্ষপাতিত্ব থাকত খেলোয়াড়দের গায়ের রঙের উপর। অতি বিখ্যাত এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে ক্লাবে ওঁর অফিসে বা টেন্টে দেখা হলে উনি মুখে আর নাকে রুমাল চাপা দিতেন. ওঁর ব্যক্তিত্ব এমন ছিল যে সেই সময়ের খেলোয়াড়রা কিছুই মনে করত না ওঁর এই আচরণ দেখে। এর রহস্য খেলোয়াড়রাই প্রকাশ করেছিলেন তারা প্রাক্তন হয়ে যাবার পরেই। তবে উনি ছিলেন ক্লাব অন্তপ্রাণ। তাই কিছু ছোটখাটো ব্যাপার সবাই এড়িয়ে গেছে সেই সময়। আন্তরিকতা ভুলিয়ে দেয় অনেক কিছুই।

আজও যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ আছে আমার বিভিন্ন ফুটবলের সাথে জড়িত ক্লাবের সঙ্গে, আর সেটাই মাঠে থাকার, আনন্দে থাকার উপাদান।

সেই সব ছবিগুলো

ভাস্কর গুপ্ত

কালো পিচঢালা চওড়া রাস্তাটা রাসবিহারী এভিনিউ থেকে লম্বভাবে বেরিয়ে সর্দার শঙ্কর রোড, জনক রোড পেরিয়ে কোথায় যে চলে গেছে! ও জানে না। ও জানে এই রাস্তাটার নাম বসন্ত রায় রোড। এই বাড়িটারও একটা নাম আছে। মধুসদন। সেই বাড়িটার একতলার জানালা ধরে ও রাস্তা দেখে। কত লোক যায়, ছেলেরা খেলা করে। ও দেখে আর শোনে। শব্দ শোনে। গন্ধ নেয়, ফুলের। সন্ধেবেলা রাসবিহারী এভিনিউ ধরে যখন হেঁটে হেঁটে মার সঙ্গে দেশপ্রিয় পার্কে যায় তখন গাছ ভর্তি পাখিদের কিচিরমিচির শোনে, আর গন্ধ পায় ফুলের, বকুল ফুল, মা বলেছেন। সকাল বেলায় মর্নিং ওয়াক, জ্যাঠামণির হাত ধরে। হাঁটতে হাঁটতে লেক, কখনও চিল্ড্রেন্স পার্ক কখনও হ্যাঙ্গিং ব্রিজ। চিল্ড্রেন্স পার্কে একটা মস্ত বড় স্লিপ আছে। উঁচু। ওর খুব ভালো লাগে ঐ স্লিপে চড়তে। হ্যাঙ্গিং ব্রিজে উঠলে অনেক মাছ দেখা যায়। মাছদের ও মুড়ি খেতে দেয়। রামের সুমতির রামের মতো ও মাছদের নাম দিয়েছে কার্তিক, গণেশ, যুধিষ্ঠির বলরাম এইসব। ফেরার পথে জ্যাঠামণি কিনে দেন ক্যাডবেরি চকোলেট, অরেঞ্জ ফ্লেভার। মা বলেন, "পুরোটা খাবে না কিন্তু বাবু"... না: ও খায় না। ভাগ দেয় গুড়ে ভাই আর মেনকামাসিকে। ওরা লজ্জা পায়, লুকিয়ে লুকিয়ে খায় গুড়েভাই।

ও দেখেছে সন্ধেবেলা মই নিয়ে একজন লোক এসে জ্বালিয়ে দিয়ে যায় ঐ "গ্যাসবাতি"। ও স্কুলে যায়, লেকমার্কেটের কাছেই, সেন্ট মেরিজ কার্মেল স্কুল। মোড়ের মাথায় জলযোগের দোকান, ভিতরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি।

ডোভার রোডে মাসির বাড়িতে গেলে দেখতে পায় একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা ল্যাম্পপোস্ট। ওদের বসন্ত রায় রোডের রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের মতো না। মা বলেন ওগুলো গ্যাসবাতি। ও দেখেছে সন্ধেবেলা মই নিয়ে একজন লোক এসে জ্বালিয়ে দিয়ে যায় ঐ "গ্যাসবাতি"। ও স্কুলে যায়, লেকমার্কেটের কাছেই, সেন্ট মেরিজ কার্মেল স্কুল। মোড়ের মাথায় জলযোগের দোকান, ভিতরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি। ওখানে পাউরুটি পাওয়া যায়, কেকও। এসব মা কিনে দেবেন না। ওর জন্য বাবা নিয়ে আসেন অফিস ফেরত ফার্পো থেকে পাউরুটি, গ্রেট ইস্টার্নের কেক।

এই স্কুলটা মার পছন্দ না। ও তাই ভর্তি হবে বাংলা স্কুলে। জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন। সোনামামা, মণিমামারা ঐ স্কুলে পড়েছেন। ও একদিন দেখে এসেছে স্কুলটা। মস্ত বড় ঘড়ি লাগানো একটা স্কুলবাড়ি। ওর ভয় করছিল। ওর ভালো লাগে বাড়িতেই। ওর ঘরের জানালাটা। মোটা মোটা শিক দেওয়া জানালা, লাল রঙের মেঝে। স্কুল থেকে দুপুর বেলা ফিরেই ও জানালার ধারে গিয়ে বসে। চুপচাপ নিঝুম দুপুরে ওর রাস্তাটাকে খুব দু:খী মনে হয়।

সেই দুপুরগুলোতে, বাড়ির সামনের রাস্তাটা যখন ঘুমায়, তখন দূর থেকে একটা গান ভেসে আসে। রোজ। একই সময়। আস্তে আস্তে গানটা এগিয়ে আসতে থাকে। ওর জানালার সামনে যখন আসে ও পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে

একটা লাঠিতে ভর দিয়ে একপায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে যাচ্ছে এক উদাস গায়ক। চলে যাচ্ছে দুপুর পেরিয়ে, বিকেল ছুঁয়ে সন্ধ্যার দিকে।

আর আসে রোগা লম্বা ধুতি শার্ট পরা হরিসাধন। বিকেল বিকেল। সুর করে সে বলে যায়:

"হরিসাধনের টিপিন খানা
খোকাখুকুরা পয়সা নিয়ে এসো না"
কেমন সে " টিপিন"? ও জানে না। ওর কাছে তো পয়সা থাকে না। ও দেখে চাঁদু শিবুরা কিনে নিয়ে যাচ্ছে কী যেন। ও মনে মনে কিনে নেয় একবাক্স "টিপিন" আর নিজের মনেই সুর করে বলে যায় "হরিসাধনের টিপিন খানা"...

টিং টিং করে ঘন্টা বাজলেই ও জানে কে আসছে! কাচের বাক্সে গোলাপি রঙের বলগুলো! ওগুলোকে বলে বুড়ির মাথার পাকা চুল! ও একবার খেয়েছিল। আলিপুরে বড়মাসির বাড়ি থেকে চিড়িয়াখানায় গিয়ে। চিত্রাদি কিনে দিয়েছিল। ও জানালায় দাঁড়িয়ে রঙ দেখে আর শোনে ঘন্টার শব্দ। টিং টিং। সেই দইওলার মতো সেও কি চলে যায় নদী পেরিয়ে অনেক দূরের কোনও দেশে?

"কেক ওয়ালা, কেক ওয়ালা" বলে কালো ট্রাঙ্ক মাথায় নিয়ে যায় যে লোকটা, তার বাড়ি কোথায় কে জানে? কোথা থেকে পায় কেক, প্যাটিস আরও কত কি! ও জানে না। স্কুলের ছুটির পর জুলিয়ানা, ফ্রান্সিস্কা জ্যোতির্ময়দের দেখেছে কেকওয়ালার কাছ থেকে কেক কিনতে। ও যখন বড় হবে তখন একদিন পুরো এক ট্রাঙ্ক কেক কিনে নেবে। ঠিক ঠিক ঠিক।

বিকেলবেলার ভট ভট শব্দটা যখন দূর থেকে শোনা যায়, ও দৌড়ে গেটের কাছে চলে যায়। এটা তো খেলার শব্দ! একটু একটু করে রাস্তা ধুতে ধুতে এগিয়ে আসে ভিস্তিওয়ালা। কেমন করে পাইপটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাস্তা ধোয় সে। একটুখানিও বাদ থাকে না। পাইপ থেকে জল যখন সাদা সাদা ফেনা হয়ে পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে, ওর ইচ্ছে করে ঐ ফেনায় পা ডুবিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে যায় ভিস্তি ওয়ালার সঙ্গে।

যাওয়া তো হয় নি ওর কোথাও। কেক কেনাও হয়নি এক ট্রাঙ্ক। ঘুমের মধ্যে ওর কান এখনও শুনতে পায় লাঠি ঠুকে চলে যাওয়া গায়কের গান। শুনতে পায় সন্ধেবেলার "বেলফুল বেলফুল" ডাক। স্বপ্নে এখনও তাকে ডাকে " হরিসাধনের টিপিন খানা"।

গভীর রাতে বেহালা বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে চলে যেত কে? কে গাইত গলা ছেড়ে বুকফাটা কান্নার গান? তাদের ও দেখে নি, কিন্তু সেই সব হারিয়ে যাওয়া বর্ণ, গন্ধ, ছবি আর সুর ছুঁয়ে ছুঁয়ে কেটে যায় ওর দিন ওর রাত....

রূপান্তর

আশিস কুমার সেন

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার শহরতলি কলকাতার প্রভাবে শহরের রূপ ধারণ করছে। তারই এক খণ্ডচিত্র ...

শহর থেকে অনেক দূরে এই গাঁয়েতেই আমার বাড়ি,

আজও মেঠো ধুলো পাবে, গাছগাছালি সারি সারি।

আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়েই পেয়ে যাবে অপুর বাড়ি,

তারই পাশে মাঠের ধারে দেখতে পাবে তালের হাঁড়ি।

শরৎকালে কাশের দোলা কালো দিঘির ছায়ায় ঘেরা,

এই পথেতেই পাবে তুমি হাজার অপুর পায়ে ফেরা।

সেই যে বোড়াল নেই সে এখন যানবাহনের চলাফেরায়,

সজল দিঘি পাল্টে গেছে বহুতলের আকাশছোঁয়ায়।

রঙটা অনেক বদলে গেছে বায়ুদূষণ গাড়ির ধোঁয়ায়।

বিভূতিভূষণ-সত্যজিতের অনেকটা তাই স্মৃতির পাতায়।।

জন্মশতবর্ষে আমাদের প্রণতি
আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন শিক্ষক, ভাষাবিদ্
জ্যোতিভূষণ চাকী-র প্রতি।

'বার্ষিক খেয়া'য় আমরা তাঁর স্মরণে লেখা আহ্বান করছি। জুলাইয়ের ৫ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠাবেন নিম্নোক্ত ইমেল বা হোয়াটসঅ্যাপে। স্মৃতিচারণে কোনো নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যা নেই। তাঁকে ঘিরে যাঁর যতটুকু স্মৃতি সেটুকুই লিখে পাঠান।

chatterjee.santanu@gmail.com
debdip@gmail.com
WhatsApp No. +91 98310 50252